কোনদিকে যাবো

কাজী জহিরুল ইসলাম

বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে ঘরে ঢোকে শিলা, ওর নিজের ঘরে ।

ড্রয়িংরুমটা পেরিয়ে যাবার সময় হুমায়ূনের সাথে চোখাচোখি হয় । তাতে ওর কিছুই এসে যায় না, শরীরের ভাঁজগুলিতে এই রকম একটি অভিব্যক্তি খেলিয়ে খুব সাবলীল ভঙ্গিতে হেঁটে যায় । সজোরে ভেজানো দরোজা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসরণ করে চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে । শিলা ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরে, চুমু খায় দু'জন দু'জনকে । ড্রয়িংরুমের ইজি চেয়ারে শুয়ে, হা হয়ে থাকা দরোজার ফাক দিয়ে, হুমায়ূন দেখে সেই দৃশ্য । এক পর্যায়ে ছেলেটি ওর বুকে হাত রাখে ।

কি সর্বনাশ, এখনি কাপড় খুলবে নাকি ! হুমায়ূনের এ উদ্বেগকে পাত্তা না দিয়ে দরোজা বন্ধ করে দেয় ওরা ।

বিষয়টি নিয়ে আর ভাবতে চায় না হুমায়ূন । কিন্তু না চাইলে কি হবে । ভাবনার বিশ্রী পোকাটা চুইংগামের আঠার মতো ওর চকচকে তালুতে সারাক্ষণই বসে থাকে । বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে অনেকক্ষণ । ঘুম আসে না । এক পর্যায়ে পিঠ ব্যথা করে, ঘাড় ব্যথা করে । শরীর বাঁকিয়ে মেরুদন্ড ফুটানোর চেষ্টা করে হুমায়ূন । ডানে-বাঁয়ে মাথাটাকে ঘুরিয়ে বেশ দক্ষতার সাথে ঘাড় ফোটায় । মটমট করে ঘাড় ফোটে । আরো কিছুক্ষণ মরার মতো পড়ে থাকে । এবার ঘাড় এবং পিঠের ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে । কিছু মানুষ থাকে খুব কাজ পাগল । একটার পর একটা কাজ করে যায় । উদগ্রীব হয়ে থাকে নতুন কাজের জন্য । আর কিছু মানুষ আছে যারা কাজ থেকে, দায়িত্ব থেকে, দূরে সরে থাকতে চায় । হুমায়ূন এদের দলে । অবসর গ্রহনের আগে ভেবেছিল অবসর জীবনটা খুব সুখের হবে । ইচ্ছে মতো শুয়ে বসে কাটানো যাবে । কনকনে শীতের সকালে অফিসে যাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠতে হবে না । অথচ এখন মনে হচ্ছে শুয়ে-বসে কাটানোটাও একটা কাজ । ইংরেজী ব্যকরণের ভার্ব-এর মতো । এই কাজ থেকেও মুক্তি চায় হুমায়ূন ।

হঠাৎ খুব ঘাবড়ে যায় লোকটি । ওর শুয়ে থাকা অলস দেহটা হাত দেড়েক শূন্যে লাফিয়ে উঠে আবার আছড়ে পড়ে বিছানায় । নিজেকে শক্ত করে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরে রাখতে চাইছে হুমায়ূন কিন্তু কিছুতেই পারছে না । কি আশ্চর্য, বলা নেই কওয়া নেই পশ্চিম পাশের দেয়ালটা হঠাৎ চার ইঞ্চি পরিমান ফাক হয়ে গেল ? ভয়ে ওর সমস্ত শরীরে থরহরি কম্পন । তবে কি ভূমিকম্প হচ্ছে ? কই, শোকেসে সাজিয়ে রাখা কাচের গ্লাসগুলোতো ভাঙছে না । আমেরিকা থেকে ছেলের পাঠানো টাকায় বাড়িটা বানিয়েছে এখনো ছ'মাস হয়নি । ভয়টা কেটে গিয়ে দুঃখে হুমায়ুনের বুক ভেঙে কান্না আসছে । ছোট্ট শিশুর মতো শব্দ করে কেঁদে ফেলে হুমায়ূন । আর কি আশ্চর্য, ঠিক তখনি ফাটলটার ভেতর থেকে কোন অদ্ভুত প্রাণীর জিহবার মতো একটি লম্বা হাত বেরিয়ে আসে । অবিকল মেয়ে মানুষের হাত । সুডৌল, মসৃণ আঙুলগুচ্ছ । হাতটা যেন ওর চোখের জল মুছে দেবার জন্য ধীরে ধীরে ওর মুখের ওপরই চলে আসছে । হুমায়ূন এবার প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে ওঠে । আর সাথে সাথেই মেয়েলি হাতটা সুড়ুৎ করে ডিসটেম্পার করা সবুজ দেয়ালের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায় । এবং কি অবাক কান্ড দেয়ালটাও সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেল ।

হুমায়ূন বিছানার ওপর উঠে দাঁড়ায় । হাত দিয়ে ভাল করে দেয়ালটা ঘষে ঘষে দেখে । না, কোথাও কোন ক্র্যক নেই । ফাটলতো দূরে কথা কোন দাগ পর্যন্ত নেই ।

তবে কি আমি স্বপ্ন দেখলাম ? গায়ে চিমটি কাটে হুমায়ূন । মাথার চুল টানে । এইতো ব্যথা পাচ্ছি ।

আজকাল সবকিছুকেই কেমন স্বপ্ন মনে হয় । মনে হয় বাস্তবতা থেকে সবকিছু কেমন দূরে সরে যাচ্ছে ।

পরের রাতেও একই ঘটনা ঘটে । ঘড়ি দেখে হুমায়ূন । একটা পঁয়ত্রিশ । ঠিক একই কায়দায় কোন রকম শব্দ না করেই দেয়ালটা ফেটে গেল । একটি দেয়াল দুটি হলো । ধীরে ধীরে দুটি দেয়াল সরে গেল দুই দিকে । মাঝখানের ফাটল থেকে

বেরিয়ে এলো একটি ধবধবে সাদা হাত । আজকের হাতটি আর ফুট দুয়েক নয়, টেন্টাকলের মতো ক্রমশ লম্বা হয়ে সেটি নেমে এলো হুমায়ূনের মুখের ওপর । হুমায়ূন ভয় পায়, তবে চিৎকার করে না । চিৎকার করতে পারে না । মুখ ফিরিয়ে নেয় উল্টোদিকে ।

এ-কী ! শুধু পশ্চিম পাশের দেয়ালটাই না, পুরো ঘরটাই যেন দু'ভাগ হয়ে গেছে । আর ঠিক একই সমান্তরাল রেখায় পূর্ব পাশের দেয়াল থেকেও বেরিয়ে এসেছে অবিকল একই মাপের একই আকৃতির আরো একটি হাত । যেন ঘরটি তার দুই স্কন্ধ থেকে দুটি অদ্ভুত হাত বের করে হুমায়ূনকে ডাকছে ।

এসো হুমায়ূন, আমি তোমাকে মুক্তির পথ দেখাবো ।

এরপর থেকে রোজ রাত একটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে একই ঘটনা নিয়মিত ঘটতে থাকে । হুমায়ূন কাউকেই বলে না সে কথা । এমনিতেই পরিবারে ওর অবস্থান খুব নড়বড়ে । এসব কথা বললে নির্ঘাত হেমায়েতপুর পাঠাবে । হেমায়েতপুর যাবার রিস্ক ও নিতে পারে না । কিন্তু এই রকম একটি কথা ক'দিনইবা চেপে রাখা যায় ? অবশেষে এক সকালে বলে ফেললো । হাসিনা বেগম গাছে ঝুলে থাকা একজোড়া পাকা পেপের মতো বুকটা কাঁপিয়ে হেসে উঠলো এবং হাসতেই থাকলো । যেন এমন হাসির ঘটনা কেউ কোন দিন শোনে নি ।

বিকেলে একবার হাসিবের কাছে যাও । আমার মনে হয় .....কথাটা শেষ না করেই সুগন্ধি জর্দ্দা দিয়ে সাজানো এক খিলি পান মুখে পুড়ে দিল হাসিনা বেগম ।
কেনো ? আমি হাসিবের কাছে যাবো কেনো ? আমি কি অসুস্থ ?
কোন সুস্থ মানুষ এসব কথা বলে না ।

হুমায়ূনের কোন কথাকে গুরুত্ব না দেওয়া এ সংসারে নতুন কিছু নয় । কিন্তু এই বিষয়টাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় হুমায়ূন খুব রেগে যায় । রেগে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে সিরামিকের দামী এশট্রেটা তুলে মেজেতে ছুঁড়ে দেয় । সঙ্গে সঙ্গে সেটি অসংখ্য টুকরো হয়ে হুমায়ূনের জেদ মেটাতে এদিক-সেদিক ছুটে যায় । হুমায়ূন বিস্মিত হয় নিজের ক্ষমতা দেখে । শুধু যে এশট্রেটা ভাঙতে পেরেছে তা-ই নয়, বিস্মিত হবার সবচেয়ে বড় কারণ হলো ওটা ভাঙার পরে ওর একটুও ভয় লাগছে না । বুক ধরফর করছে না । আশ্চর্য তো ! অথচ অবসর গ্রহনের পর থেকে এই সাহসটাকেই ও খুঁজে পাচ্ছিলো না ।

হাসিনা বেগমও কম বিস্মিত হয় না । বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় । ওর সামনে বসে থাকা এই বৃদ্ধটি যে রাগ করে কিছু একটা ভাঙতে পারে অন্তত গত পাঁচ বছরে এ বিশ্বাসটা ও হারিয়ে ফেলেছিল । কিছু একটা বলতে যাবে হাসিনা, এমন সময় দরোজায় টোকার শব্দ হয় ।

মে আই কাম ইন মাম্মি ?
ইয়েস কাম ইন ।

উচ্ছল ভঙ্গিতে ঘরে ঢোকে শিলা । বয়ফ্রেন্ডের নিপুন হাতের কাজ, ওর লাগাম ছাড়া বুকটা হাঁটার চেয়ে দ্রুত গতিতে লাফাতে থাকে । ও দুটো যে এখন বেশ বড় হয়েছে এবং ঢেকে রাখার জন্য যে লিনেনের পাতলা জামার বাইরেও একটা কাপড় জড়ানো দরকার, সেদিকে কোন খেয়াল নেই ওর ।

এদিকে আয় মা, বোস । হাসিনা বেগমের গায়ে গায়ে ঘেষে বসে শিলা । লেডিস পারফিউমের ভারী গন্ধ ফ্যানের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে পুরো ঘরে ।

তোর বাবার কান্ড দেখেছিস ? এশট্রের ভাঙা টুকরোগুলো দেখায় হাসিনা । আরো কি সব বলছে জানিস ?
মা, তুমি যে কি-না, না বললে কি করে জানবো ?
রোজ রাত একটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সময়নিষ্ঠভাবে এ ঘরটা নাকি দু'ভাগ হয়ে যায় । এবং দু'দিক থেকে দু'টো হাত এসে তোর বাবাকে ডাকে । নাম ধরে ডাকে, এসো হুমায়ূন, এসো হুমায়ূন বলে ।
ওয়াও ! ভেরি এক্সাইটিং । তারপর ?

মনে হলো কথাটা তুই বিশ্বাস করেছিস ?
করবো না কেন, হুমায়ূন আহমেদের বইয়ে এরকম ঘটনা কত পড়েছি । বাবাওতো আরেক হুমায়ূন আহমেদ । বাবা, এটা কি তুমি স্বপ্নে দেখো ?
আরে ধ্যৎ, এটা স্বপ্ন তোকে কে বললো ? বাস্তব । তোর বাবাতো বাস্তবেই এটা দেখে ।
আর তখনি মা মেয়ে একসঙ্গে ওদের শিল্পসম্মত শরীর দুটো দুলিয়ে কাচভাঙা শব্দে হেসে উঠলো ।

কোরাস হাসিটার জবাব দিতে হুমায়ূন সাহেব খাট থেকে উঠে বইয়ের আলমারির কাছে এগিয়ে যান । খাটো আলমারির ওপর থেকে ক্রিস্টালের ফুলদানিটা তুলে একই কায়দায় ছুঁড়ে দেন এশট্রের ভাঙা টুকরোগুলোর কাছে । সাথে সাথে যা হবার তা-ই হলো । ফুলদানীটা ছাতু হলো ।

মা, বাবার প্রেসার-ট্রেসার ঠিক আছেতো ? মামাকে ফোন করো । আর আমাকে ঝটপট কিছু টাকা দাওতো বাইরে যাবো ।

হঠাৎ করেই যেন হুমায়ূনের রাগটা পড়ে গেল । শিলা কিংবা হাসিনা কারো ওপরই এখন আর হুমায়ূনের কোন রাগ নেই । যেখানে অসুস্থ মানুষের সংখ্যাই বেশি, সেখানে সুস্থদেরই বরং অসুস্থ মনে হওয়া স্বাভাবিক । যে মেয়েটি বাবার চোখের সামনে বয়ফ্রেন্ডের সাথে ওসব করে, সে কতোটা সুস্থ ? যে মা মেয়েকে এসব কাজে উৎসাহিত করে সে-ইবা কতোটা সুস্থ ? হুমায়ূনের মনে হয় ওরা দু'জনই অসুস্থ । হুমায়ূন মনে মনে ওদের দু'জনকেই মাফ করে দেয় ।

কিন্তু ওরা হুমায়ূনকে মাফ করে না । সন্ধ্যার পর ডাক্তার আসে । হাসিব ডাক্তার । হাসিনার ছোট ভাই হাসিব, পিজির রেসিডেন্সিয়াল সার্জন । হুমায়ূনের নাড়ি পরীক্ষা করে হাসিব, স্টেথিসকোপ লাগিয়ে বুক দেখে । লঞ্চের হর্ণ টেপার মতো করে প্রেসার মাপার যন্ত্রটার রাবারের বল টিপে টিপে প্রেসার মাপে । না, কোথাও কোন গন্ডগোল নেই । দুলাভাই, ইউ আর কমপ্লিটলি ওকে ।

হাসিবের এ কথায় হুমায়ূন খুশি হতে পারে না । কারণ ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে শরীর পরীক্ষা করিয়ে ওকে অপমান করা হয়েছে । আশ্চর্য তো ! এই অপমানবোধটা এতোদিন কোথায় ছিল ? ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে এ বাড়িতে আরো কতো কিছুইতো ঘটে । অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে । কই আর কখনোইতো মনে হয়নি ওকে অপমান করা হয়েছে । এমনকি ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক ইওরোপিয় ছোকরার সাথে নীলার বিয়ে হওয়াতেও ও কিছু মনে করে নি, করতে পারে নি ।

অবসর গ্রহনের পর থেকে একটি কাজ অত্যন্ত বিরক্তির সাথে হুমায়ূনকে করতে হয় । রোজ সকালে বাজারে যেতে হয় । বাজার থেকে মাছ-তরকারি কিনে আনতে হয় । এসব মাছ-তরকারি নিয়ে বাড়িতে অনেক ঘটনা ঘটে । একবার ইলিশ মাছ নিয়ে এক মহাকেলেঙ্কারি কান্ড ঘটে গেল । বাজারে দু'ধরণের ইলিশ মাছ পাওয়া যায় । পদ্মার ইলিশ আর মেঘনার ইলিশ । হুমায়ূন পদ্মা-মেঘনা চেনে না, চেনে ইলিশ । বড় বড় দুটি ইলিশ নিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ি ফেরে হুমায়ূন । হাসিনা বেগম মাছ দুটো ব্যাগ থেকে বের করে কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই সোজা দোতলা থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে মারে । মেঘনার ইলিশ হাসিনার দুই চোখের বিষ । হাসিনার কাছে মেঘনার ইলিশগুলো দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষ, আর হুমায়ূন তখন কারাগারে বন্দী নেলসন ম্যান্ডেলা । দুটো মাছ গেছে এতে কোন দুঃখ নেই । কিন্তু ইলিশ দুটো এমনি বজ্জাত, পড়বিতো মাটিতে পড়, না গিয়ে পড়লো মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি লতিফ সাহেবের রসগোল্লার মতো টসটসে টাকের ওপর । আর কি অসম্ভব গালিগালাজ রে বাবা । হুমায়ূন মনে মনে লতিফ সাহেবকে মসজিদ কমিটির সেক্রেটারীর পাশাপাশি বাংলাদেশ গালিগালাজ সমিতির সেক্রেটারীর পদটাও দিয়ে দিল । গালিগালাজ সমিতির সেক্রেটারী লোকজন ডেকে সালিশ বসালেন । সালিশে এত্তোগুলো মানুষের সামনে হাসিনার হয়ে হুমায়ূনকে ক্ষমা চাইতে হলো । কি জঘন্য কান্ড ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে হুমায়ূন বিশাল এক রুইমাছ কিনে ফেললো । মাছঅলার হাতে গুনে গুনে চার'শ আশি টাকা তুলে দিল । হাতে আর মাত্র কুড়ি টাকা । এই টাকায় আর তেমন কিছুই কেনা যাবে না । হাসিনা গলদা চিংড়ি নিতে বলেছিল । গলদা চিংড়ির ভূনা শিলার খুব পছন্দ । সম্ভবত ওর বয়ফ্রেন্ডকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে । রুইমাছ নিয়ে আরো একটা কেলেঙ্কারি হবে আজ । হোক ।

দড়িতে ঝোলানো মাছটা উঁচুতে তুলে ধরে আরো একবার দেখে হুমায়ূন । হলুদ পেটের দিকে তাকিয়ে প্রাণটা ভরে যায় ওর । এরকম লোভনীয় একটি রুইমাছ অনেকদিন আগে খুব কেনার ইচ্ছে ছিল । কিনতে পারে নি ।

আলী আকবর তখন মৃত্যুশয্যায় । বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে হুমায়ূন অনুগত সন্তানের মতো জিজ্ঞেস করেছিল, কিছু খেতে ইচ্ছে করে ? খুব অস্পস্ট উচ্চারণে আলী আকবর বললেন, রুইমাছ খেতে ইচ্ছে করে, খুব বড় রুইমাছ ।

হুমায়ূন তার মৃত্যুপথযাত্রী বাবার জন্য রুইমাছ কিনে আনতে পারে নি । কারণ বড় রুইমাছ কেনার মতো টাকা ওর কাছে ছিল না । এর কিছুক্ষণ পরেই আলী আকবর মারা গেলেন । হুমায়ূন খুব ভাল করেই জানে বড় রুইমাছ কিনে আনলেও তার বাবা সেটা খেতে পারতেন না । তার পরেও মৃত্যুপথযাত্রী পিতার জন্য টাকার অভাবে রুইমাছ কিনতে না পারার কষ্টটাই ওর কাছে বড় হয়ে রইলো ।

দড়িটা আরো একবার উঁচুতে তুলে ধরে চার'শ আশি টাকার রুইমাছটা দেখে হুমায়ূন ।

হাঁটতে হাঁটতে ঢাকা কলেজের সামনে চলে আসে । একটা রিক্সা নেয় । দুই নম্বর সড়ক ধরে জিগাতলার দিকে যাচ্ছে রিক্সা ।

স্যার, মাছটা কত নিলো ?
চার'শ আশি টাকা ।

রিক্সাঅলাদের সাথে কথা বলতে ভাল লাগে না হুমায়ূনের । অনিচ্ছা সত্বেও জবাব দেয় । এরা ইতর প্রকৃতির মানুষ । যেদিন বেশি পেসেঞ্জার থাকে, খালি রিক্সার সিটের ওপর পা তুলে বসে বসে পাছায় বাতাস লাগায় । যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলে কোন কথা বলে না । আর ভীড় দেখলে দ্বিগুণ ভাড়া হাকিয়ে নেওয়াতো আছেই । দাম-দর না করেই উঠে পড়েছে হুমায়ূন, হয়ত নামিয়ে দিয়েই বলবে, বারো টেকা দেন । অথচ নিউমার্কেট থেকে শংকর ছয় টাকা ভাড়া । ডান পাশে ভারতীয় হাই কমিশন, বাঁ দিকে বেক্সিমকোর লাক্সারিয়াস বিল্ডিং । পিচঢালা পথের দু'পাশে সারি সারি দালান-কোঠা দাঁড়িয়ে আছে । লঞ্চঘাট থেকে ওদের রতনপুর গ্রামে যাওয়ার জন্য কোন পীচঢালা রাস্তা নেই । আছে আঁকা-বাঁকা মেঠোপথ । সেই মেঠোপথের দু'পাশে আছে সারি সারি কলাবন ।

হঠাৎ করে হুমায়ূনের মনে হয় প্রতিটি দালান থেকে একটি করে অস্বাভাবিক আকৃতির হাত বেরিয়ে আসছে । সেই হাতগুলো এক অপূর্ব নাচের ভঙ্গিতে ওকে ডাকছে । একটি অস্পষ্ট সমবেত গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে । যেন সবাই একসঙ্গে ওকে বলছে, 'চলে এসো হুমায়ূন, এই নষ্ট লোকালয় ছেড়ে চলে এসো । আমরা তোমাকে আকাশে নিয়ে যাবো, তারাদের দেশে' । হুমায়ূনের ইচ্ছে হলো চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, 'কে তোমরা ?' কিন্তু করতে পারে না । কে যেন ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে । ওর সমস্ত শরীর ঘামতে থাকে । দরদর করে মেরুদন্ড বেয়ে ঘামের স্রোত নামে । কপালের বলিরেখাগুলোতে সুক্ষ্ম ঘামের বিন্দু চিকচিক করছে সৈকতের মরিচিকার মতো ।

একবার ভাবে রিক্সাঅলাকে জিজ্ঞেস করে, হাতগুলো দেখছে কি-না ? পরক্ষণেই আবার চিন্তাটা মাথা থেকে গুটিয়ে নেয় । শেষমেষ রিক্সাঅলাও ওকে পাগল ভাবুক এটা ও চায় না ।

এই রিক্সাঅলা শোন ।
রিক্সা থেমে গেল ।
কি হলো, থামলে কেন ?
আপনে না থামতে কৈলেন ।
থামতে বলোনি, শুনতে বলেছি ।
কি কৈবেন কন । আমগোরে কেউ কিছু হুনতে কয় না, খালি থামতে কয় আর চলতে কয় । আর কয় ডাইনে-বায়ে । আমরা খালি ডাইনে-বায়ে করি ।
না, কিছুনা । ঠিক আছে যাও ।

শংকরে এসে রিক্সা থামে । হুমায়ূন রিক্সা থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে, কতো দেব ?

যা ভাড়া হয় দেন ।
হুমায়ূন ইতস্তত করতে করতে ছয়টি এক টাকার নোট ওর হাতে তুলে দেয় । মনে মনে সে খুব ভয় পাচ্ছে । হারামজাদা আবার টাকাটা ছুঁড়ে মারবে না-তো ? একবার শংকর থেকে টাউন হলে গিয়ে এক রিক্সাঅলাকে চার টাকা দেওয়ায় সে টাকাটা মাটিতে ছুঁড়ে মেরে বলেছিল, টেকা লাগবো না, যান গা । কি জঘন্য অপমান । শেষ পর্যন্ত অবশ্য লোকজন জড় হয় । ক'জন ইয়াং ছেলে ওকে বেশ বকাবকি করে কলারও চেপে ধরে ।

এই রিক্সাঅলাটা তেমন কিছুই করলো না । সে খুব সহজ ভঙ্গিতে টাকাটা নিয়ে লুঙ্গির খুটে গুঁজে রাখলো । তারপর কোমর থেকে গামছা খুলে নির্বিকার ভঙ্গিতে কপালের ঘাম মুছতে শুরু করেছে । ভাল মানুষ তাহলে এখনো আছে পৃথিবীতে ।

হুমায়ূন গেটের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে আবার ফিরে এলো । ওর মনে হলো এই রিক্সাঅলাটা মানুষ ভালো । ওকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত ।

শোন, তোমার নাম কি ?
রিক্সাঅলা দাঁত বের করে হাসে । আমার নাম আলী আকবর মিয়া ।
কি আশ্চর্য এটাতো আমার বাবার নাম । মনে মনে ভাবে হুমায়ূন ।
থাকো কোথায় ?
জিগাতলা ।
বস্তিতে ?
কি-যে কন স্যার, বস্তিতে থাকুম না তয় থাকুম কৈ । সরকার কি আমগো লেইগা ফেলাট বানায়া রাখছে?
আলী আকবর মিয়া তোমার ছেলে মেয়ে কয়জন ?
আল্লাহর মাল চাইরজন । চাইরজনই পোলা । বড় পোলার নাম জাইঙ্গির ।
ঠিক আছে ঠিক আছে, আর নাম বলতে হবে না । হুমায়ূন ভাবে আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর, এরপরের জনের নাম নিশ্চয়ই হবে হুমায়ূন । হায়রে মোগল সাম্রাজ্য !
শোন আলী আকবর মিয়া । মাছটা ধর, রাজা বাদশাহর নামে নাম । এই রকম বড় মাছ না খাইলে কি চলে ? আজ আর রিক্সা চালাবে না । সোজা বাসায় চলে যাও । জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, হুমায়ূন, আওরঙ্গজেব আর তোমার স্ত্রী যোধাবাই, মোগল সাম্রাজ্যের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে মাছটা খাবে ।

রিক্সাঅলা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে হুমায়ূনের মুখের দিকে । হয়ত ভাবছে, স্যারের কি মাথা নষ্ট?

গেটের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বুকটা কেমন হালকা মনে হয় হুমায়ূনের । মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে রুইমাছ খাওয়াতে না পারার কষ্টটা যেন এইমাত্র ওর বুক থেকে নেমে গেল । সাড়ে বারটা সময় খালি হাতে বাজার থেকে ফেরাতে হাসিনার রাগ চরমে উঠে গেল । সে প্রচন্ড রাগে কোন কথা বলতে পারছে না । আজ শিলার বন্ধু আসবে । রান্না-বান্নার একটা বিশাল প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে । অথচ এখনো বাজারই আসে নি ?

হুমায়ূন নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে । পৃথিবীতে কত লক্ষ কোটি মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে । সবাই মিলে না হয় আজকের দিনটা ডাল-ভাত খেয়ে কাটিয়ে দিলাম । হুমায়ূনের এই মহৎ চিন্তা হাসিনার ধমকে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় ।
বাজার আনোনি কেন ?
হুমায়ূন কোন কথা বলে না ।
চুপ করে আছো কেন ? কত্তোবড় সাহস তোমার সাড়ে বারোটা সময় বাজার না নিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছো, কোথায় আড্ডা মারতে গিয়েছিলে ?
হুমায়ূন তবুও চুপ ।
কি হলো, কথা বলো, বাজার আনোনি কেন ?
পকেটমার হয়েছে । ভিড়ের মধ্যে কে যেন টাকাটা মেরে দিয়েছে ।

বেশ সাবলীল ভাবেই হুমায়ূন এই জলজ্যন্ত মিথ্যা কথাটি বলে ফেললো । ও ভাল করেই জানে একজন পকেটমারের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার চেয়ে একজন রিক্সাঅলার হাতে রুইমাছ তুলে দেওয়ার উদারতা হাসিনার কাছে অনেক বেশি অপরাধের কাজ । আলী আকবর মিয়াকে ও কিছুতেই হাসিনার গালি শোনাতে পারবে না ।

বাসায় ফোন করলে না কেন ? পকেটমার টাকা নিয়ে গেল আর তুমি নাচতে নাচতে ফিরে এলে কোন আক্কেলে ? জান না আজ মেহমান আসবে ? ফোন করলে আমি ফরহাদকে দিয়ে টাকা পাঠাতে পারতাম । আর কবে তোমার বুদ্ধি হবে ? হায় আল্লাহ আমি এখন কি করবো, কখন বাজার করাবো, কখন রান্না করবো.....হাসিনা সম্ভবত কেঁদে ফেলছে । হাসিনার এ করুণ অবস্থা দেখে হুমায়ূনেরও খুব খারাপ লাগে । বুকের ভেতরে টেম্পারেচার বাড়ে । ভালোবাসার বরফ ধীরে ধীরে গলতে শুরু করে ।

এক কাজ করলে হয় না নীলার মা । ফোন করে রাসেলকে বলে দাও, আজ যেন না আসে, আমাদের একটা পারিবারিক ঝামেলা হয়েছে ।
কি বললে ? দুদিন পরে যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে, তাকে বলবো আমাদের পারিবারিক ঝামেলা হয়েছে ? তুমি বের হও, এক্ষুণি বাড়ি থেকে বের হও ।

শেষ পর্যন্ত কোন সমঝোতায় আসা গেল না । ১টা তিরিশ মিনিটে হুমায়ূনকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হলো । পুনরায় বাজার করার জন্য নয়, একেবারে প্রস্থান । এর কিছুক্ষণ পরেই ড্রাইভার ফরহাদ একটি রুইমাছ নিয়ে ঘরে ঢোকে ।
খালাম্মা, এক রিক্সাঅলা দিয়া গেল ।

তেষট্টি বছর বয়সে স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন হুমায়ূন আহমেদ । নিজেকে এখন খুব ভারমুক্ত লাগছে । শংকরের অল্পপ্রশস্ত গলি-ঘুপচি পেরিয়ে হুমায়ূন বড় রাস্তায় উঠে এলো । বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে ওর বেশ ভাল লাগছে । ছেলেবেলায় স্কুল ছুটির পর ঠিক এরকম লাগতো । হাঁটতে হাঁটতে এক সময় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে হুমায়ূন । হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে সাতটা বাজে । দুপুর-বিকেল গড়িয়ে একসময় ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যা নামে । প্রকৃতির এটাই নিয়ম । সেই নিয়মের হাত ধরেই হুমায়ূন কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যেরও শেষের দিকে চলে এসেছে । এরপর কোথায় যাবে ?

সংসদ ভবনের ঢেউখেলানো সিঁড়িতে এতক্ষণ বসে থাকতে খারাপ লাগছিলো না । আশ-পাশে অসংখ্য মানুষ গিজগিজ করছিল । একটা উৎসব উৎসব আমেজ ছিল । কিন্তু রাতের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফিরে যাচ্ছে । মানুষ কোথাও থাকতে চায় না । শুধু ছুটে বেড়ায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় । কোথায় যাচ্ছে ওরা ? গন্তব্যে ? প্রিয়জনদের কাছে ? কিন্তু আমি কোথায় যাবো ? কথাটা মনে হতেই অস্থির হয়ে ওঠে হুমায়ূন । গন্তব্যহীনতার আশঙ্কায় বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে ।

এখন আর কেউ নেই । চারদিকে সুনসান নিরবতা । পরিপাটি সিমেট্রির মতো লাগছে সংসদ ভবনের এই সুবিশাল চত্বরটিকে । হুমায়ূন উঠে দাঁড়ায় । ওর খুব ভয় লাগছে । মাথাটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে । চারপাশে খুব ভালো করে চোখ বুলায় হুমায়ূন । না, কেউ নেই, একদম ফাকা । ভয়টা যেন ওকে আরো বেশি করে চেপে ধরে ।

কি আশ্চর্য ! উনি এখানে কি করে এলেন ? কি রকম হাসি হাসি মুখ করে আমাকে ডাকছে । হুমায়ূনের চিনতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না । সেই হাতাকাটা কালো কোট, সেই কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, ঢোলা পাজামা । তিয়াত্তুরের এক সন্ধ্যায় বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে উনার সঙ্গে একবার কথা হয়েছিল । সে-ই শেষ দেখা । লোকটি হুমায়ূনকে হাত নেড়ে ডাকছে আর মাঝে মাঝে মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে । হুমায়ূনের ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে, লাল ফৌজ কেনো এগিয়ে এলো না সেদিন ? হুমায়ূন মানুষটির দিকে এক পা বাড়াতেই পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠলো । চট করে পেছন ফেরে হুমায়ূন ।

কি আশ্চর্য, আপনিও ? আমাকে কেন ডাকছেন ? হুমায়ূন বেশ ভালো করেই চিনতে পারছে সামরিক পোশাক পরা এই মানুষটিকে । ওর চোখে সোনালী ফ্রেমের সানগ্লাস দেখে হুমায়ূনের খুব হাসি পায় । এই লোকের কি সত্যি সত্যি হাঁটুতে ওই জিনিস ? রাতের বেলায় সানগ্লাস পরে এসেছে কেন ? উনিও কি কিছু হারিয়েছেন ? মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে আর হুমায়ূনকে ডাকছে ।

দু'জনই দু'দিক থেকে ক্রমাগত ডাকছে হুমায়ূনকে । হুমায়ূন একবার সামনে একবার পেছনে তাকায় । আমি ভাই আপনাদের হারানো কোন ধন-রত্ন খুঁজে পাই নি যে আমাকে অমন করে ডাকছেন । আমি নিজেই খুব সমস্যায় আছি । হুমায়ূন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কোনদিকে যাবে ।